নির্মলকুমার বসু

সাতচল্লিশের ডায়েরি

পুনশ্চ

নিবেদন

নির্মলকুমার বসুর জন্মশতবর্ষে নিজের খেয়ালে তাঁর গ্রন্থ ও রচনাপঞ্জি প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। সেই সূত্রে তাঁর ভাগিনেয় শ্রী রবীন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে আমার পরিচয়। তিনি তাঁর প্রিয় মাতুলের বিপুল গ্রন্থসম্ভার ও মূল্যবান কাগজপত্র এযাবৎকাল পরমযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করছিলেন। বর্তমানে অবশ্য সেই সংগ্রহের সিংহভাগ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে তিনি দান করেছেন। তাঁরই উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় আমি এই সাতচল্লিশের ডায়েরি সম্পাদনা করতে উদ্যোগী হই। কাজটি করবার যোগ্যতা আমার আছে কিনা তা বিচার করবার অবসর পাইনি। ডায়েরিটি আমি শ্রী শঙ্খ ঘোষকে দেখিয়েছিলাম। তাঁর আদেশে এই ডায়েরির দেশ বিভাগ সংক্রান্ত অংশটি 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার জন্য সংকলন করি। সেটি 'চতুরঙ্গ'-এর ৬৪ বর্ষ সংখ্যা ২-৩ মাঘ ১৪১১-আষাঢ় ১৪১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। একাজের সেই শুরু। কাজটি শেষ হওয়ার পরে তাঁকে দেখিয়েছি। মধ্যপর্বেও আলোচনা করেছি তাঁর সঙ্গে। আমার পক্ষে বলবার কথা এইটুকুই।

আর একটি মানুষের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ্য। তিনি শ্রী শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় দেশ বিভাগ অংশ প্রকাশিত হলে তিনি একটি চিঠিতে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। সেই চিঠি উক্ত পত্রিকায় (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১২) প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর এই সহৃদয় প্রতিক্রিয়া আমাকে উৎসাহ দিয়েছে এবং তাঁর সঙ্গে সর্বত্র একমত না হলেও কয়েকটি মূল্যবান তথ্য পেয়েছি। আমি কৃতজ্ঞ।

রোজনামচা বা ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল নির্মলকুমার বসুর। তাঁর নিজস্ব বই-খাতা কাগজপত্রের বিশাল সংগ্রহের মধ্যে বছরে বছরে লেখা ডায়েরিগুলিও সঞ্চিত আছে। তারমধ্যে ১৯৪৭-এর ডায়েরিটির একটি পৃথক মূল্য যে আছে সে কথা বলাই বাহুল্য। এই ডায়েরি বর্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই বছরটি একাধারে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো বছর। তেমনই রক্তে হাহাকারে বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন বছর। এই বছরই ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা অর্জন করেছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চূড়ান্ত বীভৎসতায় পৌঁছে দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে। এই বছরই অখণ্ড ভারতবর্ষ খণ্ডিত আকার নিয়েছে।

নির্মলকুমার বসু ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। পড়াশোনায় ছেদ পড়েছিল (১৯২১-২৩), তবে তা নিতান্তই সাময়িক। জ্ঞানচর্চা তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা। তিনি অধ্যাপক, তিনি নৃবিজ্ঞানী, ভারতে স্থাপত্যবিদ্যাচর্চার পথিকৃৎ এবং আরও অনেক কিছু। এরই সঙ্গে মহাত্মা গান্ধির একান্ত সচিব হিসেবে তাঁর যে ভূমিকা তারও গুরুত্ব সামান্য নয়।

গান্ধিজির আদর্শের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ তাঁর। অনেক আগেই উভয়ের পরিচয়। নির্মলকুমার বসু সম্পাদিত *Selections from Gandhi* গ্রন্থ ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই বছরের শেষে ওয়ার্ধায় গান্ধিজির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে নির্মলকুমারের। অবশ্য এর অনেক আগে থেকেই দুজনের পত্রালাপ চলত। গান্ধি রচনা সংকলন আর গান্ধি বিষয়ক রচনার প্রয়োজনে নির্মলকুমারই চিঠি লিখতেন। উত্তরও পেতেন যথাসময়ে। ঘনিষ্ঠতা শুরু হয়েছিল ১৯৪৫ সালে, গান্ধিজি সোদপুরে যখন ছিলেন। সে সময় একদিন ডেকে বলেছিলেন :

তুমি আমার লেখা হইতেই আমাকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছ, কিন্তু আমার নিকটে থাকিয়া কাজের মধ্যে কখনও আমাকে দেখিবার সুযোগ পাও নাই। আমার লেখার মধ্যে যে মূর্তি প্রকাশ পায়, তাহা তো আমার সমগ্র রূপ নয়। তুমি আমার নিকটে থাকিলে, একসঙ্গে ভ্রমণ করিলে, প্রতিদিনের ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ করিলে আমাকে আরও ভালোভাবে চিনিতে পারিবে।

সঙ্গে থাকার সুযোগটা এল বড়ো মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে। বাংলার চারদিকেই তখন দাঙ্গার আগুন জ্বলছে। নোয়াখালি যখন সেই আগুনে বিধ্বস্ত, সন্ত্রস্ত জনমানসে শান্তি স্থাপন এবং নিরুপায় অসহায় গৃহহীন মানুষের পুনর্বাসন সাধনের লক্ষ্য নিয়ে পূর্ববাংলার সেই অঞ্চলে এসে দাঁড়ালেন আটাত্তর বছর বয়সি এই ভারত পথিক।

নোয়াখালি যাওয়ার আগের দিন গান্ধিজি নির্মলকুমারকে তাঁর সঙ্গী হতে বলেন। সেদিন ছিল গান্ধিজির মৌনদিবস, তাই তিনি লিখে জানালেন :

> I want you, if you can and will, to be with me wherever I go and stay while I am in Bengal. The idea is that I should be alone only with you as my companion and interpreter.
>
> This you should do only if you can sever your connection with the university and would care to risk death, starvation etc. Satis Babu knows all about my design. You will know from him.

নির্মলকুমার তখনই সম্মতি জানিয়ে তাঁকে লিখলেন :

> The University releases me for your service as long as you are in Bengal. All for the rest, all I can say is that I shall try to fulfil your conditions; more than that I can hardly say.

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে লিখেছিলেন :

> I have been asked by Gandhiji to go to Noakhali to help him.
>
> I have to leave for Noakhali tomorrow the 15th November. I beg to apply for leave for the period of my absence.

নোয়াখালির দিনগুলিতে নির্মলকুমার হলেন গান্ধিজির সফরসঙ্গী। তাঁর অভ্যাসমতো এই সফরের প্রতিদিনের ঘটনাবলি তিনি লিখে রাখতেন। অশোকা গুপ্তের লেখায় নির্মলকুমারের সেখানকার কর্মব্যস্ত দিনগুলির কিছু কিছু বিবরণ পাই।

গান্ধিজির সঙ্গে ভালোই পরিচয় ছিল। তাঁর সম্পর্কে পড়াশোনাও যথেষ্ট ছিল নির্মলকুমারের। বাকি ছিল একান্ত কাছ থেকে এই অসামান্য মানুষটিকে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনাচারণের মধ্যে দেখা। তাঁর জীবন ভাবনার নানা ছোটোবড়ো স্তরের নেপথ্যলোকে প্রবেশ লাভ। ১৯৪৬-৪৭-এর বছর সেই সুযোগটাও এনে দিয়েছিল।

নির্মলকুমারের গান্ধি বিষয়ক রচনাগুলি পাঠ করলে সহজেই বোঝা যায় গান্ধি-আদর্শে পরিপূর্ণ হয়েও তিনি অন্ধ অনুসরণকারী ছিলেন না। গান্ধিজির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় থেকে পরবর্তী দিনের আলোচনাগুলি প্রায়শই থাকত নির্মলকুমারের নানান উৎসুক জিজ্ঞাসায় ভরা। গান্ধিজির সঙ্গে অনায়াসেই বিচরণ করতে পারতেন সামাজিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প বিষয়ক প্রশ্নগুলি নিয়ে। কৃষক, মজুর বা ধনী-নির্ধনের কারও সমস্যার প্রসঙ্গই আলোচনায় বাদ যেত না। রাজনৈতিক বিষয়তো থাকতই পাশাপাশি অসংকোচে হাজির করতেন গান্ধিজির ব্যক্তিগত জীবনের দিকগুলিকেও। গান্ধিজির কাছে তাঁর ব্যক্তিগত বা একান্ত নিজের বলে যেন কিছুই ছিল না। জীবনের যে কোনও প্রসঙ্গ নিয়ে অসংকোচে তিনি আলোচনা করতে পারতেন। বুদ্ধিদীপ্ত যে কোনও আলোচনার আহ্বানে তিনি সাড়া দিতেন, তাকে স্বাগত জানাতেন। মহাত্মার আড়ালে থাকা মোহনদাস করমচাঁদ সহজেই সমাজবিজ্ঞানী নির্মলকুমারের বিশ্লেষণের মুখোমুখি হয়েছেন।

বেশ বোঝা যায় এমন খোলাখুলি আলোচনায় তিনি আনন্দ পেতেন। ডায়েরির সে সব প্রসঙ্গ নোয়াখালির ধ্বংসলীলা বা ভারতবর্ষের রাজনীতি থেকে আমাদের অনেক দূরের পথে চলার সঙ্গী করে।

নোয়াখালির আরব্ধ কর্ম অসমাপ্ত রেখেই বিহারে ছুটে যেতে হয়েছিল গান্ধিজিকে। কারণ একই, ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। নির্মলকুমার বসুও সঙ্গে গিয়েছিলেন। বিহারের পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখার ইচ্ছে ছিল এবং গান্ধিজির সহস্রবিধ কাজের দায়িত্ব স্বীকারে আপত্তি ছিল না। কিন্তু খুব বেশি দিন কেন তখন আর তিনি গান্ধিজির সঙ্গে রইলেন না, ডায়েরিতে সে কথা স্পষ্ট করে বলেছেন। ফিরে যাওয়ার জন্য পরোক্ষ আহ্বান এসেছে কয়েকবারই, গান্ধিজি যে তাঁর অভাববোধ করছিলেন সেকথা মহাত্মার কাছে যাঁরা ছিলেন তাঁরা অনেকেই নির্মলকুমারকে জানিয়েছিলেন। গান্ধিজিও কথাপ্রসঙ্গে বলতেন, 'বাংলায় গেলে নির্মলবাবু আবার মিলবেন।' নির্মলকুমার আর ফিরে যাননি কিন্তু বাংলায় আবার যখন গান্ধিজি এসেছেন তখন আবার তাঁকে দেখা গেল গান্ধিজির পাশে। যথারীতি দিনরাত্রি গান্ধিজির সব কাজের ছায়াসঙ্গী হয়ে থেকেছেন, দায়িত্ব সামলেছেন, যেমনটি নোয়াখালিতে করতেন, চিঠিপত্র লিখছেন, দর্শনার্থীদের সামলাচ্ছেন, সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হচ্ছেন।

শুধু গান্ধিজি নয় গান্ধি শিবিরের অন্যান্য কর্মীদের সুবিধে অসুবিধে তাঁদের সমস্যা, তাঁদের ভাবনা সব কিছুর সঙ্গেই নির্মলকুমারের মন জড়ানো। প্রয়োজনে যেমন তিনি সারারাত চিঠিপত্র-রিপোর্ট ইত্যাদি প্রস্তুত করার কাজে ব্যস্ত থাকেন তেমনি আবার কোনও কোনও রাত কাটান কোনও কর্মীর সঙ্গে আলোচনায়। সহস্র ব্যস্ততার মধ্যেও যেখানেই যান নির্মলকুমার তাঁর দৃষ্টি তখন সজাগ থাকে সেখানকার চলমান জীবনের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ণয় করে তথ্য সংগ্রহের কাজে।

নির্মলকুমার বসুর মন যেন বিক্ষুব্ধ আলোড়িত সমুদ্রের তলাকার শান্ত সমুদ্রের মতন। সেই বছরের ডায়েরি জুড়ে এইসবেরই আভাষ ছড়িয়ে আছে। আছে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযুক্ত রসদ জোগানোর ভাবনা এবং আরও নানা কথা। এই সবই ধরে রেখেছে তাঁর এই বছরের ডায়েরি। আবার তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ছোটো ছোটো ঘটনা বা আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের প্রসঙ্গও বাদ পড়ে না। আপন অধিকারে নিজের জায়গা করে নেয়।

এরই মাঝে ইংরেজ শাসক দেশ বিভাগের শর্তে শেষ পর্যন্ত এদেশের স্বাধীনতার দাবি মেনে নিলেন। দেশবিভাগ চূড়ান্ত হওয়ার পথে এগোল। পাঞ্জাব ও বাংলা বিভক্ত করার আয়োজন শুরু হয়েছিল। দুই বাংলার বিভাজন রেখা নির্ধারণ করার জন্য সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি একটি সর্বদলীয় কমিটি গঠন করলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের পাশাপাশি কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষও এই কমিটিতে ছিলেন। সভাপতি অতুলচন্দ্র গুপ্ত আর সম্পাদক হলেন নির্মলকুমার বসু। এই গুরু দায়িত্ব যখন তাঁর মনযোগের সিংহভাগ দাবি করছে তখনও তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর কাজ পুরো দমে চলেছে। আজকের আমরা রাজনৈতিক নেতাদের বা প্রশাসনিক আমলাদের গতিবিধি কাজকর্ম এবং অবস্থানের আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর, ব্যয়বাহুল্যের ঘটা দেখতেই অভ্যস্ত। আর এই ডায়েরির সংক্ষিপ্ত দিনলিপিগুলির ভিতর দিয়ে আদ্যন্ত অনাড়ম্বর সহজ জীবনচর্যায় অভ্যস্ত উন্নতশীর্ষ বলিষ্ঠমনা এই মানুষটির সাবলীল গতিবিধির যে পরিচয় পাই, তাতে দেখা যায়, বাউন্ডারি কমিটির সম্পাদক স্বয়ং প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতে সাইকেলে শহরের এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলেছেন, কোনওদিন বা কমিটির কাজ সেরে বাড়ি ফেরার সময় ধর্মতলার মোড়ে এসে দেখলেন পরবর্তী এলাকায় কার্ফু চলছে। কারও না কারও গাড়িতে বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে এসে অনায়াসে বাকি পথটুকু হেঁটে বাগবাজারের বাড়িতে ফিরছেন। আর বর্ষায় জল জমা পথ পেরিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরা তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

আবার দায়িত্বের বোঝা যতই ভারি হোক দিল্লিতে গিয়ে কনট প্লেসে ছোট্টো বুদ্বুর জন্য কাঁচের চুড়ির খোঁজ করতে ভোলেন না। তাঁর এমনি সব বিচিত্র ব্যস্ততার মধ্যে দেশ বিভক্ত হল, রাজনীতি চলল তার নিজের পথে। সেপ্টেম্বরের প্রথমে গান্ধিজি বাংলা ছেড়ে গেলেন। সেই থেকে তাঁর জীবনাবসান পর্যন্ত দুজনের আর দেখা হয়নি। কিন্তু তিনি রয়ে গেলেন নির্মলকুমারের অন্তরে, তাঁর বহুমুখী চর্চার অন্যতম বিষয় হয়ে। তাঁর অন্য কাজও বিস্তর। আর ডিসেম্বরে যখন একটা বিয়ের ব্যাপারে রাঁচি যান। তাঁর পারিবারিক সত্তাটি বেশ একটু প্রাধান্য পায়। আবার একটু বেদনা বোধ করেন বুদ্বুকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারা গেল না বলে। কিন্তু তাঁর সন্ধানি মনটি সঙ্গেই থাকে। সে যে কখন তাঁর জীবনের ছোট্ট বৃত্তটুকু অতিক্রম করে পথের খোঁজে বেড়িয়ে পড়ে তার হদিস পাওয়া যায় না। এইসব নিয়েই ভরে আছে তাঁর সাতচল্লিশের ডায়েরি।

আমরা তাঁর এবছরের দুটো ডায়েরি পেয়েছি। একটি ছোটো পকেট ডায়েরি, যাতে তাঁর প্রতিদিনের হিসেবপত্রও আছে। এই পকেট ডায়েরির ভিত্তিতে কাজ শুরু হয়েছিল। পরে আর একটি বড়ো ডায়েরির সন্ধান পাই। সেটি একেবারে ছিন্নভিন্ন অবস্থা। যাই হোক বর্তমান গ্রন্থে সেটির যথাসম্ভব বয়ান আমরা প্রতি পৃষ্ঠাতেই দিতে পেরেছি। কোথাও কোথাও পাঠোদ্ধার অসম্ভব হলে [...] এই চিহ্নের দ্বারা তা বোঝানো হয়েছে। প্রাসঙ্গিক তথ্য ও মন্তব্য যা সংযুক্ত করেছি তা এই ছোটো ডায়েরি অনুসরণে। এই বছরে তাঁর সঙ্গে অন্য যে সব মানুষের চিঠিপত্র আদানপ্রদান হয়েছিল, প্রাসঙ্গিক বোধে তার কয়েকটি এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তারমধ্যে স্বয়ং গান্ধিজি আছেন, আছেন জওহরলাল নেহরু, মনু গান্ধি, সুশীলা নায়ার প্রমুখ অনেকেই। এ ছাড়া সেসময়কার নোয়াখালির কিছু হতভাগ্য মানুষের জবানবন্দি এখানে দেওয়া হল। এগুলি সবই নির্মলকুমার বসুর সংগ্রহে ছিল, সে-কথা বলা বাহুল্য এবং এর সঙ্গে রক্ষিত হয়েছিল টুপি, ভাঙা শাঁখা ইত্যাদি, অর্থাৎ ধর্মান্তরণ বা নির্যাতনের নানা চিহ্ন।

নির্মলকুমার বসু বাংলার সীমা নির্ধারণ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক হয়েছিলেন সে কথা আগেই বলা হয়েছে। স্বভাবতই বাংলা বিভাগ সংক্রান্ত বহু কাগজপত্রও তাঁর কাছে জমা হয়েছিল। সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনির বিবৃতি, সভার নোটিশ এবং কার্যবিবরণী, সদস্যদের কাছে বা সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে অন্যদের কাছে লেখা চিঠি, তাঁকে লেখা কোনও কোনও সদস্যের চিঠি বা অন্য কারও চিঠি, দেশ বিভাগ বিষয়ে সরকার প্রকাশিত প্রস্তাব, পার্টিশান কমিশনের কাছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উপস্থাপিত মেমোরান্ডাম এই গ্রন্থে সংযোজিত করা হল। এই গ্রন্থের নির্দেশিকায় সংযোজন অংশ স্থান পায়নি।

এই দুই প্রসঙ্গে বিভিন্ন সংবাদপত্রে যেসব প্রতিবেদন প্রকাশিত হত তার বেশ কিছু অংশ নির্মলকুমার বসু সংরক্ষণ করেছিলেন। চিঠিপত্র বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রের মধ্য থেকে যেমন সংবাদপত্র প্রতিবেদনগুলি থেকেও তেমনি বেশ কিছু নির্বাচিত অংশ আমরা প্রয়োজনমতো ব্যবহার করেছি। আমরা মুখ্যত ব্যবহার করেছি আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদনগুলি। সংরক্ষিত পুরোনো কাগজপত্র জীর্ণতা সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনে সম্পূর্ণ সংবাদপত্রটি দেখার প্রয়োজন ছিল। সে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস-এর গ্রন্থাগারে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এজন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

দিল্লির ন্যাশনাল আর্কাইভস অফ ইন্ডিয়া-র ব্যক্তিগত সংগ্রহ বিভাগে নির্মলকুমার বসুর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইল সংরক্ষিত হয়েছে, তা আমার জানা ছিল না। মাত্র কয়েকমাস আগে এই কাজ যখন অনেকটাই এগিয়েছে হঠাৎ সেগুলির সন্ধান পেয়ে খুব আনন্দ ও আগ্রহ বোধ করেছিলাম। ১৯৪৭-এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সেখান থেকেও ব্যবহার করা গেল। যেগুলি (NKB PC, NA, ND) রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমার হাতে সময় বেশি ছিল না কিন্তু ন্যাশনাল আর্কাইভস কর্তৃপক্ষের মধ্যে যে সহানুভূতি

ও সহযোগিতার নিদর্শন দেখেছি তা আমাকে অভিভূত করেছে। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ গ্রন্থাগারে এদুটির অভাব বড়ো পীড়াদায়ক। ন্যাশনাল আর্কাইভস কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

দিল্লির গান্ধি সংগ্রহশালা এবং জওহরলাল নেহরু সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার সম্পর্কেও একই কথা বলব। ন্যাশনাল আর্কাইভস-এর মতোই এই দুই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে যাঁরা আছেন তাঁরা আমার কাজকে গুরুত্ব ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেছেন। প্রয়োজনীয় তথ্য ও ছবি ব্যবহারে অনুমতি দিতে তাঁরা কেউই কার্পণ্য করেননি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থে ব্যবহৃত আলোকচিত্রগুলির মধ্যে গান্ধি চিত্রের কয়েকটি নির্মলকুমার বসুর সংগ্রহে ছিল। বাকিগুলি ব্যবহার করতে পেরেছি গান্ধি সংগ্রহশালা, নতুন দিল্লির সৌজন্যে। হীরা উপজাতিদের ছবি দুটি প্রকাশ সম্ভব হল আমার কর্মস্থল অ্যানথ্রোপলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সৌজন্যে। সেকথা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করি। অনমিত্র সেনগুপ্তের সহায়তায় পাটনার পি এন অ্যাংলো সানসক্রিট উচ্চ বিদ্যালয়ের ছবিটি প্রকাশ করা সম্ভব হল। আলোকচিত্রী শ্রী দীপককুমারকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। অন্য ছবিগুলি আমার তোলা।

এই ডায়েরিতে যেসব স্থানের প্রতিষ্ঠানের বা ব্যক্তির উল্লেখ আছে সেগুলির পরিচয় সন্ধানে বাংলাদেশ বাদে আমি সব জায়গাতেই গেছি। শুধু পাটনাতে যেতে পারিনি। পাটনার তথ্য সংগ্রহে সহায় হয়েছেন শ্রী অনমিত্র সেনগুপ্ত। রাঁচিতে যখন গিয়েছিলাম আমার সেখানকার সহকর্মী শ্রী বাণেশ্বর ওঁরাও ছিলেন আমার পথপ্রদর্শক। বিভিন্ন অঞ্চলে ও ঠিকানায় আমার যাওয়া দরকার ছিল, তিনি আমার সঙ্গে থেকেছেন। রাঁচিতে সেই সন্ধানের দিনগুলি তাঁর সাহচর্যে আনন্দে কেটেছিল। ধুবড়ির কাজে সহায়তা পেয়েছি কল্যাণী দত্তের পরিবারের কাছ থেকে। মেদিনীপুরের তথ্য সংগ্রহে সাহায্য পেয়েছি তরুণ শিক্ষক শ্রী সোনার বাংলা গিরির কাছ থেকে। তাঁর অকুণ্ঠ উৎসাহী ও অনুসন্ধানী মন আমাকে মুগ্ধ করেছে। এই কাজের জন্য কাঁথি গিয়ে আমার বন্ধু শ্রী ব্যোমকেশ দাসের গৃহে সহৃদয় আতিথ্যলাভ করেছিলাম। প্রয়োজনীয় বিভিন্ন স্থানগুলিতে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন, বেশ কিছু তথ্যও সংগ্রহ করে দিয়েছেন। জয়নগর-মজিলপুরে কালিদাস দত্ত-র পরিবারের সাহায্য আমার কাজ সহজ করে দিয়েছে। নদিয়ার সাহেবনগরে সঙ্গে ছিলেন বন্ধু শ্রী সম্পদনারায়ণ ধর। তাঁর আন্তরিকতা কাজের আনন্দকে দ্বিগুণিত করেছে। চেষ্টা সত্ত্বেও যেসব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি সম্পর্কে আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি সেসব স্থানে নীরব থাকতে বাধ্য হয়েছি। আর বিস্তারিত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা থেকে বিরত থেকেছি সুবিখ্যাত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে।

আমার যে ক-খানি কাজ এ পর্যন্ত দু-মলাট বন্দি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আমার দিদি শ্রীমতী প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের। একাজেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কাজ শেষে হলে পরই তাঁর উৎকণ্ঠার অবসান হয়। তাঁর কল্যাণ কামনা আমার চির পাথেয় হয়ে থাকুক এই প্রার্থনা করি।

এই কাজ শুরু করা থেকেই বন্ধু শ্রী ইন্দ্রজিৎ চৌধুরীর আগ্রহ ও সহায়তা আমার চলার পথকে সুগম করেছে। ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিচিত্র দিকে নতুন পথ খোঁজায় তাঁর নিজের যেমন আগ্রহ তেমনি বহুকাজের ব্যস্ততা সত্ত্বেও বন্ধুদের কাজে সাহায্য করতে পারলে তিনি আনন্দ বোধ করেন। যখনই কোনও বাধায় ঠেকেছি পথ না পেয়ে হতাশ হয়েছি ইন্দ্র নিজের তাগিদেই সেই বাধা দূর করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই বন্ধুত্বের সজীব স্পর্শ যেন নিত্য অনুভব করে সঞ্জীবিত হতে পারি।

আমার আর এক বন্ধু শ্রী সুমিত মুখোপাধ্যায়। এই কাজে তাঁরও সহায়তা আমার পক্ষে বিশেষ মূল্যবান হয়েছে। এই গ্রন্থে যে কয়টি মানচিত্র ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি তিনি মুদ্রণের জন্য ব্যবহার উপযোগী করে

দিয়েছেন। বালি সাধারণ গ্রন্থাগারের খাতায় নির্মলকুমার বসুর স্বাক্ষর সহ মন্তব্যের প্রতিলিপি তিনিই আমাকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। বালি সাধারণ গ্রন্থাগারের ছবিটিও তিনি দিয়েছেন। তাঁর নিজের সংগ্রহের বই দিয়েও আমায় সাহায্য করেছেন।

আরও অনেক মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা আমি পেয়েছি তা যদি না পেতাম এই ডায়েরিতে উল্লেখিত অনেক ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের পরিচয় আমার পক্ষে দেওয়া অসম্ভব হত। শ্রীমতী সুনন্দা বসু, শ্রীমতী শুক্লা মিত্র, শ্রীমতী মনস্বিতা সান্যাল, শ্রী অশোক উপাধ্যায়, শ্রী অরণি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী অরুণকুমার সিং, শ্রী নবকুমার দুয়ারি, শ্রী পরিতোষ দত্ত, শ্রী হারাধন রক্ষিত, শ্রী গৌতম বসুমল্লিক, শ্রী আশিস হাজরা, শ্রী সুনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ডা. অসিত ভট্টাচার্য, শ্রীদেবাশিস চৌধুরী, শ্রীমতী গোপা বসুমল্লিক, শ্রীমতী সোমা বসু প্রমুখ অনেকের কাছে আমি ঋণী। সে কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

এই গ্রন্থ সম্পাদনার কাজে আমার সাফল্য ব্যর্থতা বিচার করবেন পাঠকরা। আমার দিক থেকে এটুকু বলতে পারি যে ফাঁকি দিইনি, যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি কাজটি সম্পূর্ণ করতে। এই কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষে পরোক্ষে যে সব সহকর্মী বন্ধুদের নাম জড়িয়ে রইল তাঁরা হলেন শ্রী অমিতাভ সরকার, শ্রী দুর্গাপদ বিশ্বাস, শ্রী প্রদ্যোতকুমার গুহ, শ্রী শ্রীদাম কুণ্ডু, শ্রী গৌতম বসু, শ্রীমতী মৃন্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী শকুন্তলা দে। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সম্পর্ক তাঁদের সঙ্গে আমার নয়, তাঁদের সকলকে আমার প্রীতি ও শুভ কামনা জানাই।

গ্রন্থটির মুদ্রণ বিষয়ের দায় হাসিমুখে বহন করেছেন শ্রী রোমিও দে। প্রুফ সংশোধন কাজের সহায়তায় ছিলেন শ্রী গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

পুনশ্চ-র কর্ণধার শ্রী সন্দীপ নায়ক গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব স্বীকার করে আমাকে নিশ্চিন্ত করেছেন। তিনিও আমার বন্ধু স্থানীয়, বেশ কিছুকালের পরিচয়ে তাঁর প্রতি বোধ করি একটি সহজ অধিকারের দাবি জন্মেছে। সুতরাং আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পথে যাব না। তিনি আমার ভাবনা ও পরিকল্পনার শরিক, তাঁর রুচিবোধ ও সহমর্মিতা আমাকে মুগ্ধ করে।

শ্রীপঞ্চমী ১৪১৪
কলকাতা

অভীককুমার দে

দাঙ্গাদীর্ণ নোয়াখালিতে

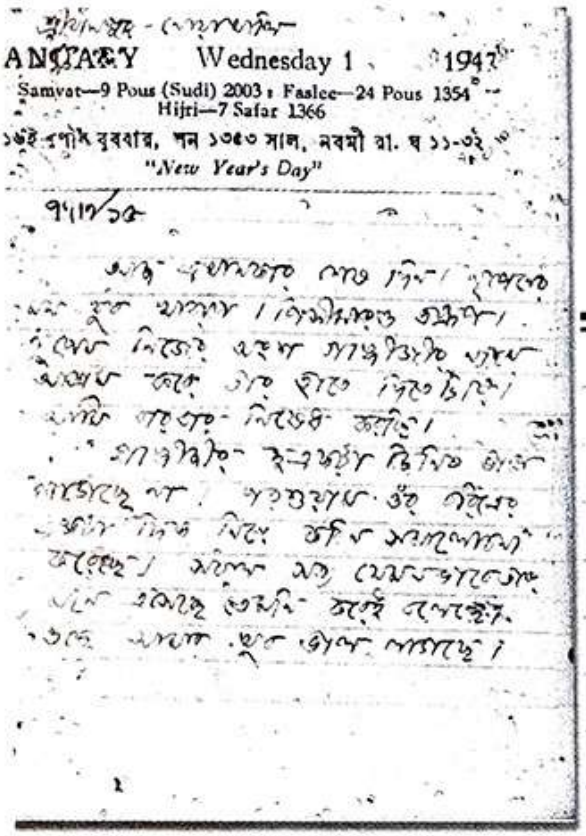
JANUARY Wednesday 1 1947
Samvat—9 Pous (Sudi) 2003 : Faslee—24 Pous 1354
Hijri—7 Safar 1366
১৬ই পৌষ বুধবার, সন ১৩৫৩ সাল, নবমী রা. ঘ ১১-৩২
"New Year's Day"

শ্রীরামপুর— নোয়াখালি

1947

1
JANUARY
Wednesday
১৬ই পৌষ বুধবার, সন ১৩৫৩

৭৭।৵১৫

আজ এখানকার শেষ দিন। নৃপেনের মন খুব খারাপ। পিসীমারও তদ্রূপ। নৃপেন নিজের অংশ গান্ধীজীর নামে আশ্রম করে তার হাতে দিতে চায়। আমি বারবার নিষেধ করছি।

গান্ধীজীর দু-একটা জিনিষ ভাল লাগছে না। পরশুরাম ওঁর চরিত্রের একটা দিক নিয়ে কঠিন সমালোচনা করেছে। সরল সত্য যেমনভাবে তার মনে এসেছে তেমনি করেই বলেছে। ওকে আমার খুব ভাল লাগছে।

* * *

ভোর [...] মিনিট থেকে বসে বসে কাল গান্ধীজীর সঙ্গে যে সব কথা হয়েছে, সে সমস্তটা লিখে ফেললাম। তারপর অনেক চিঠির উত্তর দিতে বসলাম। গান্ধীজীর মনেও সারাদিন কালকের ব্যাপারটা ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি শৈলেন চাটুয্যেকে বলেছেন, সাংবাদিকরা তাঁর পিছনে এখানকার ঘটনা নিয়ে গল্পগুজব করে এ সংবাদ তিনি পেয়েছেন। গান্ধীজী সাংবাদিকদের তিরস্কার করেছেন এই ব্যাপারটি আলোচনা এসে হিন্দু কাগজের প্রতিনিধি রঙ্গস্বামী বেচারি কেঁদে ফেললো।

প্রার্থনায় গান্ধীজী বললেন, যে প্রকৃত বন্ধু হয় সে বন্ধুকে দোষের কথা জানিয়ে মুক্ত হওয়ার দিকে সাহায্য করে। প্রার্থনা থেকে ফিরে তিনি শৈলেনবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন।

মুখে যা বলেছিল, পরশুরাম, চিঠিতে তাই পুরাপুরি লিখে দিয়েছে। কোনও অভিযোগ গোপন করেনি। নরম করে বলার চেষ্টা করেনি। অপরকে দেখানোর নিষেধ ছিল। কিন্তু গান্ধীজীকে না জানিয়ে সুশীলা নায়ার ওটা পড়েছেন। অন্যায় করা হয়েছে।

[...] কুকার, চলন্তিকা, কিছু কাগজপত্র, মাসিমপুরে তৈরি যাঁতি, কাটারি আজ কাজিরখিলে অরুণাংশুবাবুর মারফত পাঠিয়ে দিলাম। কাল খাদি প্রতিষ্ঠানের মারফত কলিকাতা চলে যাবে।

চণ্ডীপুর, নোয়াখালি

2

1947

JANUARY

Thursday

১৭ই পৌষ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৩

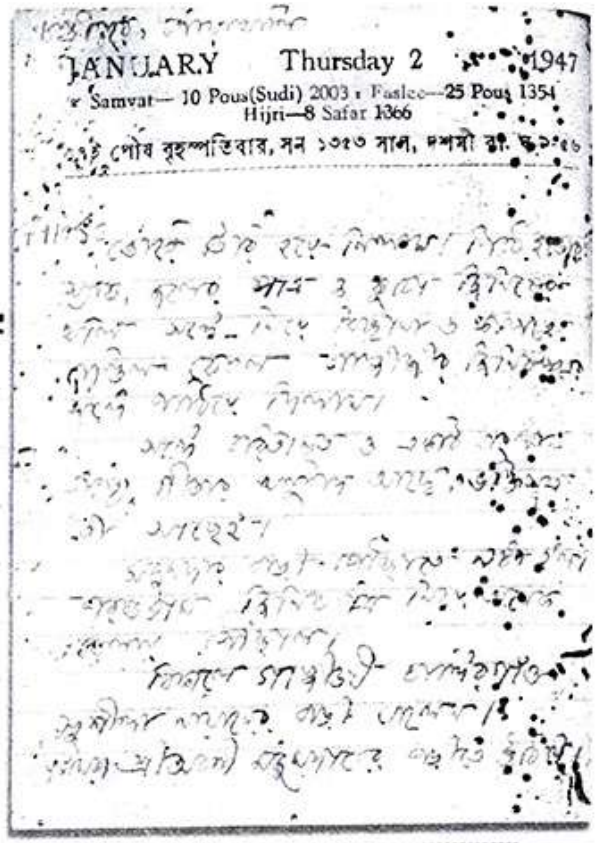

৭৭।৶১৫

ভোরে তৈরি হয়ে নিলাম। পিঠে হাভারস্যাক, জলের পাত্র ও কুচো জিনিষের থলি সঙ্গে নিয়ে বিছানা ও কাপড়ের বাণ্ডিল কেবল গান্ধীজীর জিনিষপত্রের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম।

সঙ্গে চরিতামৃত ও একটি বাংলা গদ্যে গীতার অনুবাদ আছে, ভক্তিসূত্র তো আছেই।

মজুমদার বাড়ী পৌছতে ৯টা হ'ল। পরশুরাম জিনিষ-পত্র নিয়ে অনেক বেলায় পৌছাল।

বিকেলে গান্ধীজী চাঙ্গিরগাঁও-এ সুশীলা নায়ারের বাড়ী গেলেন। আমরা শ্রী অবনী মজুমদারের বাড়ীতে উঠেছি।

JANUARY Thursday 2 1947
Samvat— 10 Pous(Sudi) 2003 : Faslee—25 Pous 1354
Hijri—8 Safar 1366

গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাত্রাপথে

মাল্য বন্ধনে

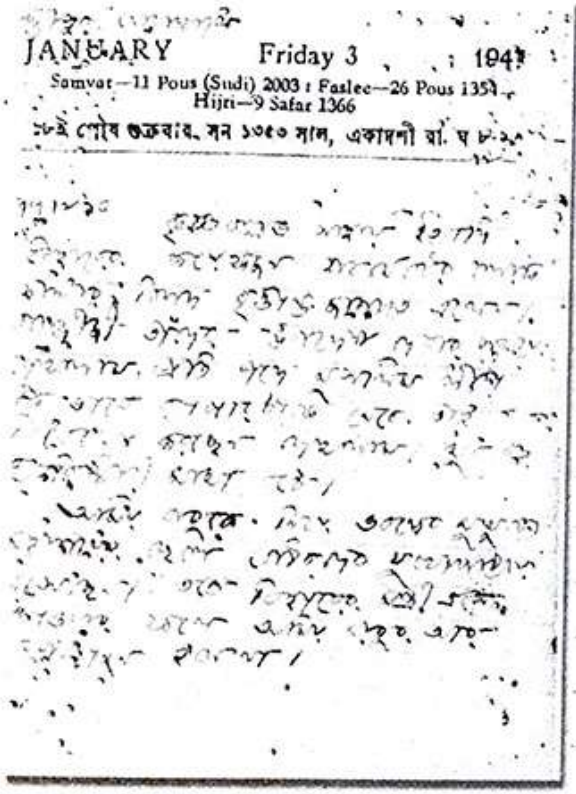

JANUARY Friday 3 1947
Samvat—11 Pous (Sudi) 2003 : Faslee—26 Pous 1354
Hijri—9 Safar 1366
১৮ই পৌষ শুক্রবার, সন ১৩৫৩ সাল, একাদশী

চণ্ডীপুর, নোয়াখালি

1947

3 JANUARY Friday

১৮ই পৌষ শুক্রবার, সন ১৩৫৩

৭৭।৵ ১৫

কৃষ্ণবল্লভ সহায় ইত্যাদি বিহারের কয়েকজন গবর্মেন্টের লোক দাঙ্গার বিশদ বৃত্তান্ত জানাতে এলেন। গান্ধীজী তাঁদের উপদেশ দেবার সময়ে দেখলাম, প্রতি পদে মুসলিম লীগ কিভাবে ব্যাপারটাকে নেবে তাই বিবেচনা করছেন দেখলাম। খুব বড় ব্যারিষ্টারী মাথা বটে।

অমিয়বাবুকে নিয়ে ভবদেব মুখুয্যে মহাশয়ের ছেলে গৌরদেব মুখোপাধ্যায় এসেছেন। তবে বিহারের মন্ত্রী এসে যাওয়ার ফলে অমিয়বাবুর আর প্রয়োজন হ'ল না।

***

ভোরবেলা গান্ধীজী আমার সঙ্গে সুশীলা নায়ারের সঙ্গে যে কথা হয়েছিল সেই প্রসঙ্গ তুললেন। তাঁর ধারণা আমি সুশীলার অপরাধ গুরুতর বলে মনে করেছি। বিষয়টি পরিষ্কার করে বললাম। পিয়ারেলাল কাছে ছিলেন। কথা শেষ করে মনে হ'ল, চিঠির আকারে লিখে ফেলি। লিখে ফেলেছি, কাল দেবো।

দুপুরে অমিয় চক্রবর্তী, ভবদেব মুখুয্যে মশায়ের ছেলে গৌরদেব মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে করে এসেছিলেন। তা ছাড়া বিহারের মন্ত্রী কৃষ্ণবল্লভ সহায় [মিঃ টি. পি...] সিং ও মিঃ হোলটন নামে দুজন অফিসার এসে গান্ধীজীকে বিহার সম্পর্কিত সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করলেন। বিকালে ৩টের সময়ে মেয়েদের জন্য এক সভা হল। তাতে গান্ধীজী মেয়েদের নিজেকে সাহসী হতে হবে এই উপদেশই দিলেন। তাছাড়া অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে বললেন, মানুষে যেমন ঠাকুরকে নিবেদন করে প্রসাদ গ্রহণ করে, তেমনি করে প্রতিদিনের খাওয়া ও পান করার জল যেন আমরা একজন নমঃশূদ্রের হাতে ছোঁওয়া পেলে তবে খাই। যে পাপ আমরা করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত এমনি করেই করতে হবে। সন্ধ্যার প্রার্থনা তমালতলা রামকৃষ্ণ আশ্রমের পোড়া বাড়ীতে হোলো। ভারি শান্ত মনে প্রার্থনা সাঙ্গ হল।

চণ্ডীপুর, নোয়াখালি

4 JANUARY 1947

Saturday

১৯শে পৌষ শনিবার, সন ১৩৫৩

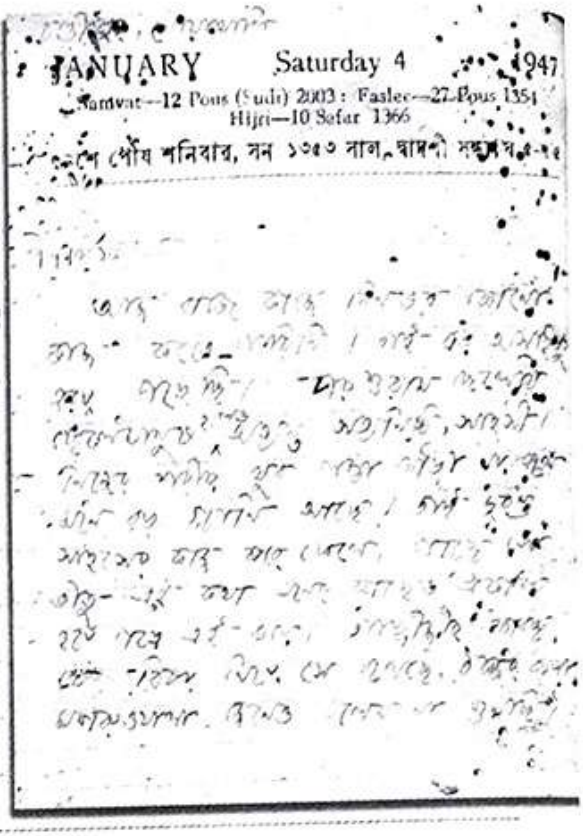
JANUARY Saturday 4 1947
Samvat—12 Pous (Sudi) 2003 : Fasle—27 Pous 1354
Hijri—10 Safar 1366

৭৭।৵১৫

আজ বাজে কাজে দিনভর কোনো কাজ করতে পারিনি। তাই বড় অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছি। পরশুরাম ছেলেটি ছেলেমানুষ হলেও অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ, সাহসী। নিজের শরীর খুব লম্বা চৌড়া নয় বলে মনে বড় গ্লানি আছে। তাই দুরন্ত সাহসের কাজ করে ফেলে। পাছে সে ভীতু এই কথা মনের কাছেও প্রকাশ হয়ে পড়ে এই ভয়ে। গান্ধীজীর কাছে যে বিষয় নিয়ে সে বলেছে, ঠক্কর বাপা, মশরুওয়ালা জেনেও বলেন না শুনছি।

***

আজ সকাল থেকে বহু কাজ জমে গেছে। কিছু কিছু কাজ করছি। কিন্তু গ্রামের লোক বা [...]

বিহারের কৃষ্ণবল্লভ সহায়, মিঃ টি. পি. সিং চারজন কর্মচারী এখানেই খেলেন। তারপর ৩।।. টের সময় চণ্ডীপুর, চাঙ্গির গাঁও গ্রামসেবা সংঘের [...].

গান্ধীজী এক বক্তৃতা করলেন। প্রার্থনা [...] হাটে হল।

পরশুরাম চলে যাবে স্থির করেছে। তার কাজে আর কোনরকমেই মন বসছে না। আমাকেও আরও চেপে কাজ করতে হচ্ছে, উপায় নাই। অথচ ঘুম যা পেয়েছে বলতে পারি না। যাই হোক ভোরে উঠেই চিঠি লেখার কাজ করতে হবে।

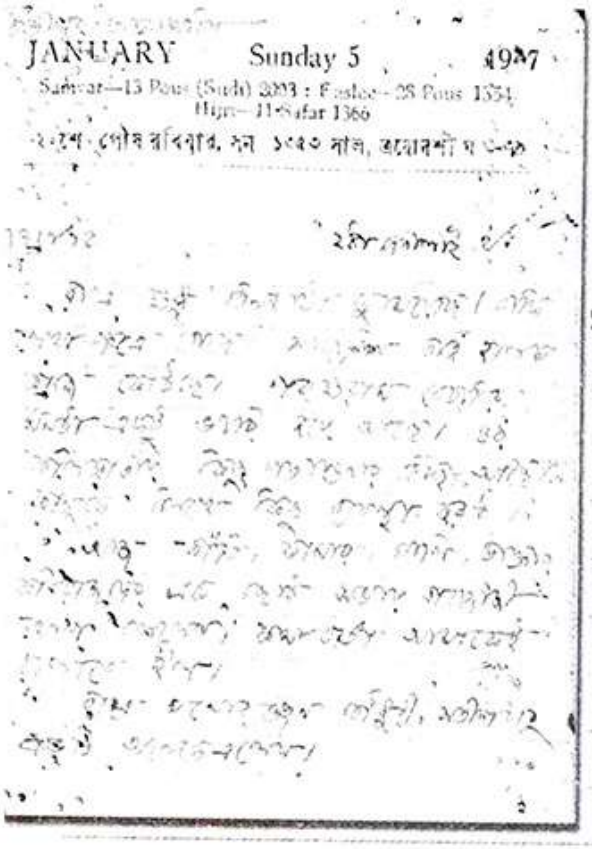

JANUARY Sunday 5 1947
Samvat—13 Pous (Sudi) 2003 : Faslee—28 Pous 1354
Hijri—11 Safar 1366

চণ্ডীপুর, নোয়াখালি

1947

5
JANUARY
Sunday
২০শে পৌষ রবিবার, সন ১৩৫৩

৭৭৷৵১৫ ২টা দেশলাই ৴১০

রাত্রে শুধু তিনঘণ্টা ঘুমিয়েছি। বাকি লেখাপত্রে গেছে। সারাদিন তাই হালকা কাজে কেটেছে। পরশুরাম বেচারির মনটা একটু ভারি হয়ে আছে। ওর কলকাতায় কিছু পড়াশুনার ইচ্ছা আছে। কানুকে লিখে কিছু ব্যবস্থা করব।

আজ তাঁতি, কামার, মালি, ডাক্তার, কবিরাজদের এক ছোট-সভায় গান্ধীজী অল্প বললেন। কথাবার্তা আমাকেই চালাতে হ'ল।

রাত্রে মনোরঞ্জন চৌধুরী, সতীশবাবু প্রভৃতি অনেকে এলেন।

* * *

কাল রাত ১১ টায় শুয়ে রাত ২টায় উঠে কাজে বসলাম। ২, ৩ আর ৪ তারিখের ডায়েরি বের করে দুপুরে গ্রামসেবা সংঘের মিটিঙের আর প্রার্থনাসভার বক্তৃতা সব পেন্সিলে লিখে ফেললাম। সকালে পরশুরাম সমস্ত খুব তাড়াতাড়ি টাইপ করে ফেললে। চিঠিপত্রের কাজ বহু সেরে ফেলেছি। সামান্য দু একখানা বাকি আছে। [...] তাঁতি, কামার, মালি, ডাক্তার কবিরাজদের সভা হয় তাতে গান্ধীজী অল্প বললেন। কারিগরদের সঙ্গে কথাবার্তা আমাকেই চালাতে হয়। বিকালে চাঙ্গির গাঁও। আমরা প্রার্থনা সভায় গেলাম।

পরশুরাম চলে যাবে বলে ঠিক হয়ে গেছে, তাই বই এর ফর্দ তৈরি করে ফেলেছে। বেচারি ক-দিন ধরে কাজকর্ম কিছুই করতে পারছে না। গান্ধীজীকে আজ বলেছে যে আপনি মেয়েদের বিছানায় শুতে আর দেবেন না এরকম প্রতিজ্ঞাই করেছিলেন। তবে ভঙ্গ করলেন কেন। উনি প্রশ্ন এড়িয়ে অন্য কথা পাড়েন। এটা ঠিক না।